অভিনন্দন-সভা

(গল্পগ্রন্থ – ছায়াছবি)

এবার দেশে গিয়ে দেখি, গৌর পিওন পেনশন নিয়েচে। কতকাল পরে ?বহুদিন...বহুদিন।

বায়ুমণ্ডলে যখন প্রজ্বলন্ত উল্কা ছুটে চলে, তখন গোটা ফটোগ্রাফ প্লেটটা সে এক সেকেন্ডে পার হয়ে যায়। কিন্তু ছ-ঘণ্টা কি সাত ঘণ্টা ঠায় আকাশের দিকে ক্যামেরার মুখ ফিরিয়ে রাখলেও নীহারিকা একচুল নড়ে না।

গৌর পিওন (গৌরচন্দ্র হালদার, জেলে) আমাদের জীবনে সেই বহুদূরবর্তী নীহারিকার মতো অনড় ও অচল অবস্থায় এক ডাকঘরে, এক ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ডাক-হরকরার কাজ করে আসচে। মধ্যে তিন বছরের জন্যে সে কেবল কোটচাঁদপুর গিয়েছিল, তাও তার মন সেখানে টেকেনি। ওভারসিয়ারের কাছে কান্নাকাটি করে আবার চলে এসেছিল আমাদের এই ডাকঘরে।

১৯১২ সালের ৭ই জুলাই সে প্রথম ভর্তি হয়েছিল এখানকার ডাকঘরে।

তার মুখেই শুনেচি, আমি তখন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতেন, ও আমাদের বাড়ি এসে বলত—টাকা নিয়ে যান বাবাঠাকুর।

আমি বলতাম—ক-টাকা ?

—ন-টাকা।

—কোন্ ডাকঘর থেকে ?

—বহরমপুর।

একবার এক বুড়ো পিওন আমাদের গাঁয়ের বিটে বদলি হল, গৌর পিওনের পড়ল অন্য বিট। বুড়ো বাড়ি এসে আগেই বলত—কট্হর নিয়ে এসো। সড়া কট্হর দেবে না, আচ্ছা কট্হর নিয়ে এসো—খাব !

তার নাম পাঁড়েজি। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। অনেকদিন এদিকে ছিল। অমনিধারা বাংলা বলত। কিন্তু তাঁর দোষ ছিল, দূরের গাঁয়ের চিঠি থাকলে হাঁটবার ভয়ে যেত না।

একবার বাঁওড়ের ধারের ঝোপ থেকে এই রকম অনেক চিঠি কুড়িয়ে পাওয়া যায়। বুড়ো পাঁড়েজির নামে নালিশ গেল ওপরে। তাকে এখান থেকে বদলি করে দিলে।

গৌর পিওন এল এরই পরে। সেই থেকেই ও এখানে আছে, মাত্র তিন বছর ছাড়া।

গৌর পিওন তিন-চার বছর কাজ করবার পরই আমি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। পুনরায় ফিরলাম দীর্ঘ আঠারো বছর পরে।

সেদিনই বিকেলে দেখি, গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এল আমাদের বাড়ি।

সত্যি আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি আশা করিনি, এতকাল পরে সেই বাল্যের গৌর পিওন পুরনো দিনের মতো চিঠি বিলি করতে আসবে।

গৌর উঠোন থেকে রোয়াকে উঠে এসে বললে—প্রাতঃপেন্নাম বাবাঠাকুর।

—গৌর যে ! ভালো আছ ?এখনো তুমি এখানে ডাক বিলি করচো ?

—আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলে যাচ্চে বাবাঠাকুর। বাড়িঘর আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল যে না থাকার জন্যে।

গৌর কিন্তু অবিকল সেই রকম আছে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হল হিসেবমতো।

গবর্নমেন্টের খাতায় যে-বয়েসই লেখা থাকুক না কেন, মাথার একটি চুলও পাকেনি। তবে সামান্য একটু কুঁজো হয়ে পড়েচে। গলায় তুলসীর ত্রিকণ্ঠী মালা বার্ধক্যের একমাত্র সুস্পষ্ট চিহ্ন।

—কতদিন চাকরি হল গৌর-কাকা ?

—তা একত্রিশ-বত্রিশ বছর।

—রোজ ক-খানা গাঁ বেড়াতে হয় ?

—পাঁচ-ছখানা গাঁয়ে বিট থাকে রোজ। পাঁচ-ছ কোশ হাঁটতে হয় দৈনিক। জলেকাদায় হানিভাঙা, দুগ্‌গোপুর, সরভোগ, দেকাটি এসব জায়গায় যেতে বড্ড কষ্ট। পা হেজে যায়, পাঁকুইহয়।

কতদিন পরে ওকে ডাকবিলি করতে দেখে এমন এক আনন্দ হল।

এতদিন পরে দেশে এলাম, বাইরের জগতে কত পরিবর্তন ঘটে গেল, আমার নিজের জীবনেও কত কি ওলট-পালট হল—কিন্তু সেই পুরাতন গ্রামে ফিরে এসে দেখি, সময় এখানে অচঞ্চল। বাঁশ আম বনের ছায়ায় পুরাতন জীবন সেইরকমই বয়ে চলেচে—গৌর পিওন সেই পুরনো দিনের মতোই চিঠি বিলি করচে।

গৌর পিওন রোজ আসে, রোজ খানিকটা বসে গল্প করে। কোনোদিন একটা নারকোল, কোনোদিন বা একটা কাঁঠাল চেয়ে নিয়ে যায়।

মাস আট-নয় সেবার বড় আনন্দেই কেটেছিল গ্রামে।

তারপরই আবার চলে যেতে হল বিদেশে। কাটল সেখানে কয়েক বছর।

এইবার আষাঢ় মাসে দেশে ফিরে এলাম আবার।

এসে দেখি, বাড়ির কি ছিরিই হয়েছে। না থাকলে যা হয়। কয়েক বছরের বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে আগাছার জঙ্গল বাড়ির ছাদ পর্যন্ত নিবিড় ঝোপের সৃষ্টি করেচে। সিমেন্ট উঠে গিয়ে রোয়াকে কাঁটানটের জঙ্গল গজিয়েচে। ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে মৌমাছিরা চাক বেঁধেচে। কলা-বাদুড় কড়িতে-বরগাতে ঝুলচে। চামচিকের দু-ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেচে মেঝের ওপর।

পরদিন সকালে গৌর পিওন বিলি করতে এল। এসে সে বললে—আজই আমার চাকরির শেষ দিন বাবাঠাকুর। বাড়ি এসেচেন, তবুও শেষ দিনটা আপনাকে চিঠি দিয়ে গেলাম।

—আজই শেষ দিন ?

—আজই বাবাঠাকুর। পঁয়ত্রিশ বছর তিনমাসে পূর্ণ হল। আর কতদিন রাখবে গবর্নমেন্ট !

—বোসো। একটা পাকা আনারস নিয়ে যাও। বাঁশবাগানে জংলি আনারস অনেক হয়ে আছে, বেশ মিষ্টি।

গৌর কিছুক্ষণ বসে গল্প করে চলে গেল।

পরদিনও দেখি সে ডাকব্যাগ ঝুলিয়ে চিঠি বিলি করে বেড়াচ্চে, সঙ্গে একজন ছোকরা বয়সের পিওন।

বললাম—কি গৌর, আজ আবার যে ?

গৌর প্রণাম করে বললে—নতুন লোক এসেচে, ও তো বাড়িঘর চেনে না, তাই ওকে নিয়ে বেড়াচ্চি।

কিছুদিন কেটে গেল।

গৌর পিওনের বাড়িতে ওর স্ত্রী অনেকদিন মারা গিয়েচে। একটি মেয়ে আছে, সেই রান্নাবাড়া করে। অবস্থা অতি দীনহীন।

একদিন ওর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি ও পরের বাড়িতে দুধ খেয়ে বেড়াচ্ছে।

গৌর বললে—বাবাঠাকুর, সামান্য পেনশনে কি চলে ?আজকাল এই বাজার। তাই দেখি, দুধ দুয়ে কিছু যদি উপরি পাই !

—একটা ছোটখাটো ব্যবসা করো না কেন ?

—বাবাঠাকুর, যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। হাতে টাকা-পয়সাও নেই যে ব্যবসা করব। এই রকম করে আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলে যাবে।

সত্যিকার দীনতামাখা মুখ ওর। দীনতা যদি বৈষ্ণবসুলভ গুণ হয়, তবে ও একজন খাঁটি বৈষ্ণব।

তারপর একটি মজার ঘটনা ঘটে গেল।

ব্যাপার এই : মহকুমা হাকিম বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর বিদায় অভিনন্দনের সভায় আমার ডাক পড়ল। খুব বক্তৃতা ও প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল সেখানে। এমন সহৃদয় রাজকর্মচারী জীবনেও নাকি কেউ দেখেননি তিনি মহকুমার যে উপকার করে গেলেন, এখানকার অধিবাসীরা কখনো তা বিস্মৃত হবে না (কি উপকার ?আজকের দিনটি ছাড়া কারো মুখে এতদিন সেই মহদুপকারের বার্তা শোনা যায়নি। কেন ?) বীরেনবাবু বক্তৃতা করতে উঠলে কানে কানে বললাম, আর কেন বেশি কথা খরচ করেন অস্তগামী সূর্যের পিছনে, সংক্ষেপে সারুন ! লুচি ঠাণ্ডা করেন কেন অকারণে !

বিদায়ী মহকুমা-হাকিম তাঁর বক্তৃতায় বললেন—তিনি এই মহকুমার জন্যে বিশেষ কিছু করেননি (খাঁটি সত্য), তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্নেহ করেন বলেই এত ভালো উক্তি তাঁর সম্বন্ধে করলেন (মিথ্যে কথা হয়ে গেল, স্নেহ করেন বলে নয়)। তিনি এখানকার কথা কখনো ভুলতে পারবেন না, ইত্যাদি।

সেখান থেকে ফেরবার পথে বার বার মনে হল, এসব বিদায়-অভিনন্দন ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে ও অসার। মহকুমা হাকিমকে তোষামোদ করতে হবে বলেই এর আয়োজন। আমি গৌর পিওনকে অভিনন্দন দেব না কেন ?সত্যিকার সমাজসেবক সে, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করে এসেচে জলঝড়কে তুচ্ছ করে—শীত মানেনি, গ্রীষ্ম মানেনি। বিনয়ের সঙ্গে, দীনতার সঙ্গে, মুখে কখনো একটা উঁচু কথা শোনা যায়নি তার।

গ্রামে তরুণ সঙ্ঘের ছেলেদের কাছে কথাটা পাড়তেই তারা তখুনি রাজী হয়ে গেল। সঙ্ঘের কর্মী নিতাই বললে—খুব ভালো কথা কাকা। নতুন জিনিস আমাদের দেশে।

বিনয় আর একজন ভালো কর্মী, সঙ্ঘের সেক্রেটারি। তার খুব উৎসাহ দেখা গেল এতে; সে বললে—রসিক চক্কত্তি দারোগাকে আমরা ও-বছর অভিনন্দন দিইচি কাকা, বাহাত্তর টাকা চাঁদাতুলে। আপনি জানেন না, সে অতি ধড়িবাজ লোক ছিল, ঘুষ খেত দু-তরফ থেকেই। তাকে যখন অভিনন্দন দিয়েচি—

—সে সভায় সভাপতি কে ছিল ?

বরেন দাঁ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

—ঐ যার দোকান ?

—আজ্ঞে, যে এ-বাজারে কাপড়ের চোরা-বাজারে লাল হয়ে গেল। সে একাই পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়েছিল।

—দেবেই তো। দারোগার সঙ্গে ভাব না থাকলে চোরাবাজার হয় কি করে ?

সন্ধ্যার সময় তরুণ সঙ্ঘের কর্মীরা এসে জানালে, কাজ তারা আরম্ভ করে দিয়েচে। তবে বাজারের অনেকেই হাসচে। বরেন দাঁ সবচেয়ে বেশি। বরেন দাঁ চাঁদা দেবে না। সে বলে—গৌর পিওনের অভিনন্দন ! এ মতলব কার মাথায় এল ?দুর ! তোমরা বাবা লোক হাসালে দেখচি ! লোকে কি বলবে ?কে কবে শুনেচে, ডাকহরকরা পেনশন পেলে তাকে আবার ফেয়ার-ওয়েল-পার্টি দেওয়া হয় ?হাকিম-দারোগাদের দেওয়া হয় জানি !

বিনয় বলেচে—আপনাদের কাল চলে গিয়েচে বরেন জ্যাঠা। একালে গরিব লোকেরাই অভিনন্দন পাবে। দিন চাঁদা। আমরা শুনব না, দশ টাকা দেবেন আপনি। কেন দেবেন না ?

এই নিয়ে উভয় পক্ষের তর্ক হয়ে গিয়েছে। বরেন চাঁদা দেয়নি, শেষ পর্যন্ত নাকি বলেছিল, আট আনা নিয়ে যাও। বিনয় না নিয়ে চলে এসেচে।

তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। বিনয়কে বললাম—বুধবার অভিনন্দন সভা, বাজারের বড় চাঁদনীতে সবাইকে জানিয়ে দাও—

বিনয় বললে—আপনি শুধু পেছনে থাকুন, আমাদের ওপর কাজ করবার ভার রইল।

দু-তিন দিন খুব বর্ষা হল। আমি আর কোথাও বেরুতে পারিনি। ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েচে তার খোঁজ নিতে পারলাম না। বুধবার দিন বিকেলের দিকে সেজেগুজে বাজারের দিকে বেরুলাম।

জিনিসটা কি আমিই নষ্ট করে দিলাম ?একবার দেখা দরকার।

বাজারে যেতেই দেখি, কেম্বিসের জুতো পায়ে, গায়ে জামা, গৌর পিওন আমার আগে আগে চলেচে।

বড় চাঁদনিতে গিয়ে দেখলাম, ছোকরার দল দিব্যি সভা সাজিয়েচে। রঙিন কাগজের মালা, দেবদারু পাতা, মায় কলাগাছ—কিছু বাদ যায়নি। স্কুল থেকে চেয়ার-বেঞ্চি আনিয়েচে। ভেঁপু মুখে দিয়ে তারা বলে বেড়াচ্চে—"আজ বেলা পাঁচটায় অবসরপ্রাপ্ত পিওন শ্রীগৌরচন্দ্র হালদারের বিদায়-অভিনন্দন সভা হবে বড় চাদনিতে—আপনারা দলে দলে যোগদান করুন।"

স্কুলের ছেলেরা ভিড় করে এল সভায়। মাস্টারদের মধ্যে কেউ বাদ রইলেন না। বাজারের লোকও সকলে এল—কি হয় দেখতে। ফলে সভা আরম্ভ হবার আগেই বসবার আসন সব ভর্তি হয়ে গেল। লোকে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করলে।

বিনয় নিয়ে এল বরেন দাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে। স্মিতমুখে বরেন দাঁ সভায় ঢুকে আমাকে দেখে একটু যেন দমে গেল।

তাহলে কি সভাপতি তাকে করা হবে না ?আমাকে বললে—ভায়া যে ! কবে এলে ?

—আমি তো এসেচি চার-পাঁচদিন হল।

—তাই !

—তার মানে বরেন-দা ?

—এখন সব বুঝলাম ভায়া। তুমি যে এসেচ জানতাম না। এখন বুঝলাম।

—কি বুঝলে ?

—তোমারই কাজ। নইলে গৌর পিওনের অভিনন্দন ! এমন উদঘুট্টি কাণ্ড আবার কার মাথায় আসবে ?তা ভায়া, আজকের সভাপতিত্বটা তুমিই করো।

আমি পল্লীগ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মনের ভাব বুঝি নে ?এত বোকা আমি নই !

তৎক্ষণাৎ বললাম, ক্ষেপেচ বরেন-দা ?তুমি হাজির থাকতে আমি ! কিসে আর কিসে ! তা হয় না। চলো দাদা, তোমাকে আজকের দিনের—

—না না, শোনো ভায়া...

বরেন দাঁর মুখে খুশির ঔজ্জ্বল্য। আমি ওকে হাত ধরে টেনে সভাপতির চেয়ারে এনে বসালাম।

আমার ইঙ্গিতে গৌর পিওনকে সভাপতির আসনের পাশে বসানো হল। একেবারে প্রেসিডেন্টের পাশের চেয়ারে...জনমণ্ডলীর উন্মুক্ত দৃষ্টির সামনে।

এ-ও আজ সম্ভব হল। গৌর পিওনের দিকে চেয়ে দেখলাম। ওর মুখও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে।

গৌর চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখচে, একি ব্যাপার ! সে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেনি যে তার সভা এমন চেহারার হবে বা তাতে এত লোকের সমাগম হবে। বরেন দাঁর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্কুলের হেডমাস্টারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি, আড়তদার নৃপেন সরকারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি সে-সভা অলঙ্কৃত করবেন তাঁদের মহিমময় উপস্থিতির দ্বারা। ছেলেরা সভায় দলবেঁধে এল, প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে ফুলের মালা, একজনের হাতে চন্দনের বাটি। উদ্বোধনী সঙ্গীত শুরু হল :

‘শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে’

রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই হবে, যার যা জানা আছে, সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল হল বা না হল। পাড়াগাঁয়ে কে কটি রবীন্দ্রনাথের গান জানে ?যা জানে ওই ভালো। লাগাও—

আমি সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করবার সময় বললাম—

আজকের এই জনসভায় বিশিষ্ট সমাজ-সেবক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়ের অভিনন্দন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য দেশের অলঙ্কারস্বরূপ (কিসে ?) উদারহৃদয় (একদম বাজে) কর্মী আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য (নির্জলা মিথ্যে) প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আর কি) অনুরোধ করচি, তিনি দয়া করে অদ্য (দয়া করবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছেন)—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি ছোট মেয়ে সভাপতির গলায় ফুলের মালা দিলে। কার্যসূচীর প্রথমেই আমি লিখে রেখেচি, ‘সভাপতি কর্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়কে মাল্য-চন্দন দান’। অতএব সভাপতিকে গৌর পিওনের কপালে চন্দন মাখিয়ে দিতে হল (কেমন মজা, বরেন দাঁ) এবং মালা পরিয়ে দিতে হল। সে কি হাততালির বহর চারিদিকে ! বেচারি গৌর পিওন বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। একে একে বক্তাদের ডাকা হতে লাগল। আমিই নাম-তালিকায় একের পর এক বক্তার নাম লিখে দিয়েচি। যথা—

১। স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—গদাধরবাবু।

২। স্কুলের শিক্ষক, মহাদেববাবু।

৩। স্টেশনমাস্টার।

৪। পোস্টমাস্টার।

৫। আড়তদার নৃপেন সরকার।

৬। কবিরাজমশাই।

৭। প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিতমশাই।

৮। চামড়ার খটিওয়ালা রজবালি বিশ্বাস।

৯। বস্ত্র-ব্যবসায়ী রামবিষ্ণু পাল।

১০। আমি।

১১। সভাপতি।

এদের মধ্যে অনেকে সভায় বক্তৃতা কখনো দেয়নি। সভায় দাঁড়িয়ে উঠে, মুখ শুকিয়ে গলা কাঠ হয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখে বক্তারা আর কিছু বলবার না পেয়ে, গৌর পিওনকে একেবারে আকাশে তুলে দিলে।

না, গদাধর ডাক্তার মন্দ বললেন না। মহাদেববাবু বৃদ্ধ হলেও শিক্ষিত ব্যক্তি, মোটামুটি গুছিয়ে দু-চার কথা যা হোক একরকম হল। স্টেশনমাস্টার হাত-পা কেঁপে অস্থির। পোস্টমাস্টার খুব ভালো বললেন,তবে অনভ্যাসের দরুন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

বক্তৃতার শেষে তিনি ঝোঁকের মাথায় একেবারে ছুটে এসে—‘ভাই রে গৌর ! আজ আর তুমি ছোট আমি বড়ো নই, আজ তুমি আমার ভাই।'—বলে একেবারে নিবিড় আলিঙ্গনে গৌর পিওনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দস্তুরমতো ‘সীন’ যাকে বলে। লোকে মজা দেখে খুব হাততালি দিয়ে উঠল।

তারপরই আড়তদার নৃপেন সরকার। বেচারি অত হাততালির পরের বক্তা। জীবনে এই সর্বপ্রথম তিনি সভায় দশজনের উৎসুক দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছেন। বেচারি প্রথমেই বলে ফেললেন, “আমরা একজন মহাপুরুষের বিদায়-উৎসব সভায় একত্র হয়েচি”। যাকে বলা হচ্চে সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

কবিরাজমশাই সংস্কৃত শ্লোক-টোক আবৃত্তি করে সভাটাকে কুশণ্ডিকার আসর করে তুললেন। মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম বাস করেন, অতএব গৌর পিওন ছোট কাজ করত বলে ছোট নয়, সেও ব্রহ্ম। উপনিষদের ঋষিদের তপোবনের এই আবহাওয়া বইয়ে দেবার পরে প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত বেচারি মহা ফাঁপরে পড়লেন, কিন্তু তার চেয়েও ফাঁপরে পড়ল চামড়ার খটিওয়ালা—রজবালি বিশ্বাস।

স্কুলের পণ্ডিত ভালোমানুষ লোক, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের গুণ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা শেষ করলেন।

নানা কারণে তাঁকে বরেন দাঁর মুখের দিকে চাইতে হয়।

রজবালি বিশ্বাস বললে, এ পর্যন্ত তার চিঠিগুলো ঠিকমতো বিলি করেছে গৌর, অমন পিওন আর হয় না। এইখানেই ইতি।

আর কোনো কথা বার হয় না তার মুখ দিয়ে। ঘেমে উঠল আর অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। পরে হঠাৎ ধপ করে বসে পড়ে বক্তৃতার উপসংহার করলে।

রামবিষ্ণু পাল বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, সৎলোক, গৌরকে তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। বাল্যে গৌর পাঠশালায় তার সহপাঠী ছিল, এইটুকু মাত্র বললেন। আমি এক মানপত্র লিখে এনেছিলাম, তাতে গৌর পিওনের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা বলা ছিল। মানপত্র পড়ে আমি গৌরের হাতে দিলাম।

সভাপতি বরেন দাঁ ঘুঘু লোক, সভার গতি কোন্‌দিকে সে অনেকক্ষণ বুঝেছে।

সভাপতির অভিভাষণে সে গৌর পিওনের এমন সব গুণের বর্ণনা করে গেল, যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গৌর পিওন প্রকৃতই দেখলাম লজ্জিত হয়ে উঠেচে ওর সব কথা শুনে এবং বিস্মিত সে নিশ্চিতই হত, কিন্তু তাঁর বিস্ময়-বোধের শক্তি আজ অনেকক্ষণ সে হারিয়ে ফেলেচে।

গৌর পিওন কিছু বলতে উঠে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। শুধু সে হাতজোড় করে সভার সকলের দিকে চেয়ে দু-তিনবার বললে—বাবুরা—বাবুরা...

তারপর সবাইকে করজোড়ে বার বার প্রণাম করে সে ধপ্ করে বসে পড়ল।

এবার সভা ভঙ্গ হবে। ছোকরার দল অমন গেয়ে উঠল:

—'তোমার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলে'

—না, রবীন্দ্রনাথের গান চাই।

বিনয়কে বললাম—খাইয়েচো ?

চাঁদনীর পাশে হরি ময়রার দোকানে হাত ধরে গৌর পিওনকে নিয়ে যাওয়া হল।

গেল সে। সে চলে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে। আমিও গেলাম ওদের পেছনে পেছনে।

তা ছেলেরা আয়োজন করেচে ভালো।

দুটো ফজলি আম, দই, সন্দেশ, নিমকি। বড় রাজভোগ যে-কটা পারে গৌর খেতে। খেয়ে কি খুশি বেচারি। চোখে তার প্রায় জল এসে গেল আবার।

আমার দিকে চেয়ে সে বললে—এমন দিনডা যে হবে তা ভাবিনি। সব আপনার কাণ্ড, আমি তা বুঝিচি। কি খাওয়াডাই খাওয়ালেন, কি ভালো কথাই বললেন আমার সম্বন্ধে। বড় গুরুবল আমার।

বললাম—খুশি হয়েচো গৌর ?

—ওই যে বললাম বাবাঠাকুর, এমনধারা দিন যে আমার আসবে তা...

ওর গলায় এখনো সেই ফুলের মালা।